কৃষিতে ভিয়েতনামের বিস্ময়কর সাফল্য

আমাদের যা অনুসরণীয়

শাইখ সিরাজ

আমরা যারা সত্তরের দশকে ম্যাট্রিক বা ইন্টারমিডিয়েটের ছাত্র ছিলাম ভিয়েতনামের কথা শুনলেই তাদের চোখের সামনে ভেসে উঠতো যুদ্ধের ভয়াবহ সব দৃশ্য। আমাদের দেশে যখন স্বাধীনতা যুদ্ধ চলছে ভিয়েতনামে তখন মার্কিন বাহিনী চালাচ্ছে ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ। রেডিও খুললেই বিবিসি, ভয়েস অব আমেরিকায় কেবল ভিয়েতনামের যুদ্ধের খবরই পাওয়া যেত। আমাদের মনের ভেতর ভিয়েতনামের যে-ছবিটি ছিল সেটা হলো যুদ্ধবিধ্বস্ত রুগ্ণ অর্থনীতির একটা দেশ। কিন্তু সেখানে গিয়ে আমাদের এ ধারণা একেবারে পাল্টে গেলো। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ১৯৭৫ থেকে ২০০৫ পর্যন্ত এশিয়ার একটি দেশ হয়েও ভিয়েতনাম এগিয়ে গেছে অনেক দূর। কিন্তু গত ২০ বছরে আমাদের যেভাবে এগোনোর কথা ছিল আমরা কি ততটা গিয়েছি।

সেখানে নেমে প্রথমেই যেটা আমাকে সবচেয়ে বেশি অবাক করলো সেটা হচ্ছে পাঁচ বছরের একটা শিশু সাইকেল চালিয়ে স্কুলে যাচ্ছে। একটা দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি কতোটা উন্নত হলে এটা সম্ভব । কোনো ট্রাক এসেও শিশুটিকে ধাক্কা দিয়ে ফেলেদিচ্ছে না। আবার কোনো ছেলেধরাও তাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে না। ওর বাবা-মা হয়তো জানেও না কখন সে স্কুলে যাচ্ছে আর কখন ফিরছে। এয়ারপোর্ট থেকে বাসে করে যাওয়ার পথেই ওদের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পর্কে আমার ধারণা পরিষ্কার হয়ে গেলো। পুলিশকে সবাই প্রচণ্ড সমীহ করে। কেউ গাড়ি ওভারটেকও করছে না, আবার কেউ রং সাইডে গাড়ি পার্কও করছে না।

ভিয়েতনাম দেশটা মূলত উত্তর ভিয়েতনাম এবং দক্ষিণ ভিয়েতনাম এ দুটি অংশে ভাগ হয়েছে। হ্যানয় থেকে সায়গন অর্থাৎ বর্তমানের হোচিমিন সিটি দূরত্ব প্রায় ১৮০০ কিলোমিটার। হ্যানয় হচ্ছে উত্তরের দিকে আর সায়গন দক্ষিণ দিকে। সায়গন এয়ারপোর্টে নেমে গাড়িতে করে ৩০০ কিলোমিটার পথ পেরিয়ে কান্থসিটিতে যাই।

ওখানে আমি ছিলাম সাত দিন। এ সাত দিন মূলত কৃষির ওপরেই কাজ করেছি। ’৭৫-পরবর্তী সময় থেকে ’৮৮-র আগ পর্যন্ত

মেকং ডেল্টা রিভার একসময় ভিয়েতনামীদের চোখের জল হিসেবে পরিচিত ছিল। এখন প্রতিটি গ্রামের বাড়ির সামনে দিয়েই ব্লক করে কৃত্রিম নালার মাধ্যমে নদী থেকে পানি সরবরাহ করা হ’Q ফসলি জমিতে

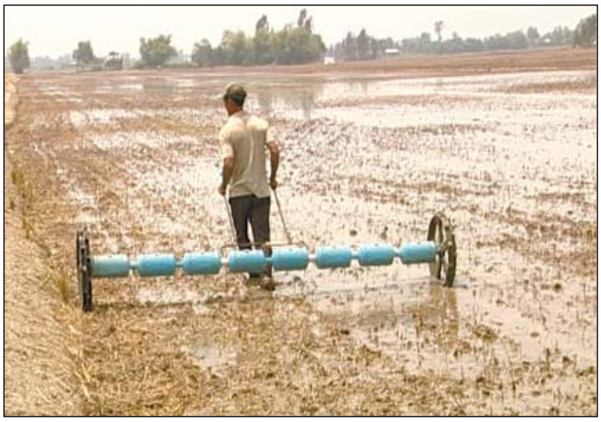

‘ড্রাম সিডার’ নামের একটা নতুন প্রযুক্তি দিয়ে বীজটা সরাসরি জমিতে বুনে দিচ্ছে। এখানেই ওদের ২০-২৫ দিন সময় বেঁচে যায়

ভিয়েতনাম ছিল খাদ্য ঘাটতির দেশ। ভিয়েতনাম কম্যুনিস্ট দেশ হওয়ার কারণে কৃষি জমির মালিকানা ছিল সরকারের হাতে। কৃষক জমিতে যে শস্য উৎপাদন করতো তা থেকে সে একটা নির্দিষ্ট অঙ্কের পারিশ্রমিক পেতো কৃষক। কৃষক পারিশ্রমিকের বাইরে কিছুই পেতো না, যেহেতু জমির মালিকানা সরকারের। একজন কৃষক জমিতে এক মণ ফসল উৎপাদন করলে যে পারিশ্রমিক পেতো দশ মণ ফসল উৎপাদন করলেও সেই একই পারিশ্রমিক পেতো। যার ফলে তার মধ্যে বেশি ফসল ফলানোর আকাঙ্ক্ষা কাজ করতো না। ভিয়েতনামে খাদ্য ঘাটতির পেছনে এটাই ছিল মুখ্য কারণ।

’৮৮ সালে ভিয়েতনাম সরকার ‘দইমই পলিসি’ হাতে নিল। ‘দইমই’ একটা ভিয়েতনামি শব্দ যার ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে রিফর্মস্ বাংলায় যাকে বলে সংস্কার। দইমই পলিসির মাধ্যমে তারা সংস্কার করলো পুরো সিস্টেমটাকে। নতুন করে ঢেলে সাজানো হলো কৃষি খাতের অবকাঠামো। আদি নিয়মকানুনগুলো ভেঙে প্রবর্তন করা হলো নতুন নিয়ম। এক কথায় এটাকে কৃষি বিপ্লব হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে শুধুই কৃষি কেন গোটা ব্যবস্থার ভেতরই আসলো পরিবর্তন। যে সমস্ত জমি সরকার অধিগ্রহণ করে নিয়েছিল সেগুলোর মালিকানা কৃষকদের হাতে ফিরিয়ে দেয়া হলো। ’৮৭ পর্যন্ত সে দেশে যেখানে খাদ্য ঘাটতি ছিল, জমির মালিকানা ফিরিয়ে দেয়ার প্রথম বছরেই, অর্থাৎ ’৮৮ সালে ভিয়েতনাম নিজেদের চাহিদা মিটিয়ে ১ লাখ টন খাদ্যশস্য রপ্তানি করতে সক্ষম হলো। বর্তমানে দেশটি পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম চাল রপ্তানিকারক দেশ। সেই সংস্কার কর্মসূচিই তাদের জন্য অর্থনৈতিক, সামাজিক থেকে আরম্ভ করে সব ক্ষেত্রেই নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করে দেয়। এই পরিবর্তনকে পুঁজি করে চলছে বলেই আস্তে আস্তে ভিয়েতনাম এখন পুরো পৃথিবীর মানুষের দৃষ্টিতে চলে আসছে। সেখানে এখন বিদেশী বিনিয়োগ বাড়ছে। বাইরের কোম্পানিগুলো যৌথভাবে সেখানে ব্যবসা করতে দারুণ আগ্রহী।

সংস্কারের পর থেকেই দেশটি কৃষিক্ষেত্রে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। খাদ্যশস্য উৎপাদন থেকে শুরু করে আধুনিক কৃষি কৌশল, কৃষি প্রযুক্তি, কৃষি গবেষণা সর্বক্ষেত্রেই তারা এখন অনেক উন্নত। কৃষিশস্যের মধ্যে প্রথমে ধানের কথাই বলি। সেখানে বিভিন্ন ধরনের উচ্চ ফলনশীল হাইব্রিড জাতের ধান আছে। খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে তারা এখন পুষ্টিকর ধানের গবেষণা করছে। ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য কোন ধরনের ধান উৎপাদন করা যায় সেটা নিয়ে তারা গবেষণা চালাচ্ছে। অন্ধত্ব রোগ নিবারণের জন্য কোন প্রকার ধান উৎপাদন করা যায় সেটাও তাদের গবেষণার অধীনে রয়েছে। আমাদের দেশে তিন ফসলি জমির সংখ্যা খুবই কম। অধিকাংশ জমিই দু’ফসলি। বিজ্ঞানের কল্যাণে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে কিছু কিছু জায়গায় আমরা এখন বছরে তিনটি ফসল পাচ্ছি। কিন্তু ভিয়েতনামীরা অনেক জমিতেই বছরে চারটা ফসল পায় স্বল্পমেয়াদী ধানের জাত ব্যবহার করে তারা ৪টি ফসল পাচ্ছে। ফলনের সময়টা কমিয়ে আনার বিষয়টা নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর একটা উন্নতি। আমাদের দেশে বীজ বপন থেকে শুরু করে কাটা পর্যন্ত ধান উৎপাদনে সময় লাগে ১২০ থেকে ১৪০ দিন। আর ভিয়েতনামীরা ধান উৎপাদন করে ৯০ দিনের মধ্যে। সময় কমিয়ে আনার পেছনে ধানের ভ্যারাইটি এবং টেকনোলজি দুটোই কাজ করছে। আমাদের দেশে ধান উৎপাদন করতে প্রথমে বীজতলা করা হয়। ২২-২৩ দিন পর বীজতলা থেকে চারা তোলা হয়। এরপর সেই চারাগুলো শ্রমিক দিয়ে জমিতে বপন করা হয়। তারপর সেটা বড় হয়ে ধান দেয়। কিন্তু ভিয়েতনামে কোনো বীজতলা করা হয় না। ওরা ‘ড্রাম সিডার’ নামের একটা নতুন প্রযুক্তি দিয়ে বীজটা সরাসরি জমিতে বুনে দিচ্ছে। এখানেই ওদের ২০-২৫ দিন সময় বেঁচে যায়। বীজতলা তোলা এবং লাগানোর পেছনে যে শ্রম ও সময় আমরা ব্যয় করছি সেটাও তাদের সাশ্রয় হচ্ছে। ড্রামসিডার প্রযুক্তিতে বীজ নষ্ট হওয়ার আশঙ্কাও কম থাকে। আমাদের এখানে এক বিঘা জমিতে প্রয়োজন পড়ে ১০ কেজি বীজের। কিন্তু ওদের ওখানে ৫ কেজি বীজ দিয়েই সেটা হয়ে যাচ্ছে। তারপর ধানের চারাগুলো যখন বীজতলা থেকে তোলা হয় সেগুলো দুর্বল হয়ে পড়ে। মাঝে-মধ্যে চারার শেকড় নষ্ট হয়ে যায়। এই চারাগুলো আবার জমিতে এনে লাগানো হচ্ছে। তাই আমাদের দেশে প্রতি বিঘায় যেখানে ২০-২২ মণ ধান পাওয়া যায়, উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে ওরা পাচ্ছে ৩৮ মণ। সময় বেঁচে যাচ্ছে, শ্রমিক ব্যয় কমে যাচ্ছে আবার উৎপাদনও বেশি হচ্ছে। এই টেকনোলজিগুলোই ভিয়েতনামকে এতোদূর এগিয়ে নিয়ে গেছে।

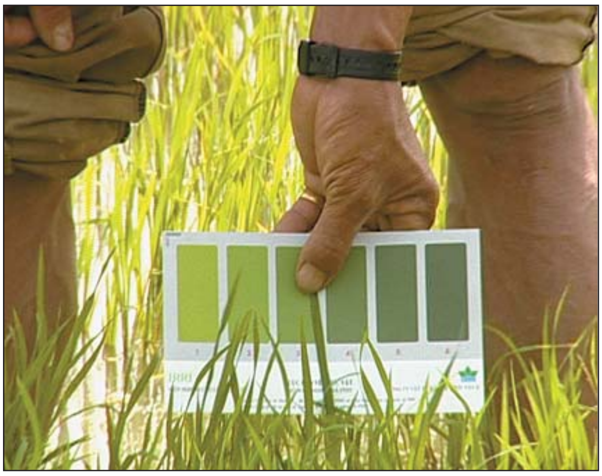

লিফ চার্টে চারটা রঙ দেয়া আছে। হলদে সবুজ, হালকা সবুজ, একটু গাঢ় সবুজ এবং পুরোপুরি সবুজ। পাতার রঙ যদি হলদে সবুজের সঙ্গে মিলে তাহলে তার জমির মোট পরিমাণের সঙ্গে চার গুণ করলে যে সংখ্যাটা দাঁড়ায় তত কেজি সার দিতে হবে।

খাদ্যশস্যে তারা এখন শুধু ধানের ওপর নির্ভরশীল নয়। অল্প জমিতে বেশি ফল পাচ্ছে বলে ধানের জমিগুলো এখন ব্যাপকভাবে ফল উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। ভিয়েতনামীরা তাদের দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় প্রচুর পরিমাণে ফল রাখছে। যুদ্ধের সময় ভিয়েতনামীদের লতাপাতা খেয়ে জীবন ধারণ করতে হয়েছিল। এ অভ্যাসটা এখনো তাদের মধ্যে রয়ে গেছে। এজন্য তাদের খাদ্যতালিকায় বিচিত্র ধরনের শাকসবজি ও নানান লতাপাতা পাওয়া যায়। সব ধরনের লতাপাতা তারা সেদ্ধ করে খায়। এজন্য তাদের শারীরিক গঠন খুব শক্ত ও পেটানো হয়। ফলে ওদের দেশের মানুষের কর্মশক্তি হয় প্রচুর এবং সবাই খুবই কর্মঠ। এভাবে খাদ্যতালিকা থেকে আস্তে আস্তে ভাতটাকে কমিয়ে দিয়ে তারা শাকসবজি, ফলমূল ইত্যাদির দিকে বেশি ঝুঁকছে। ধান রপ্তানি করছে, আর শাকসবজি, ফলমূল বেশি করে খাওয়ার ফলে কৃষকের কাছে এগুলো

উঠানের ভেতরেই ছোট ছোট ৮-১০টি পুকুর খুঁড়ে পলিথিনের ওপর পানি ঢেলে ওখানেই রেণু ছাড়ছে। রেণু থেকে ওখানেই মাছগুলো বড় হচ্ছে

উৎপাদনের চাহিদা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে।

এ তো গেলো কৃষিবিজ্ঞানের প্রযুক্তিগত বিদ্যার কথা। মেকং ডেল্টা রিভার একসময় ভিয়েতনামীদের চোখের জল হিসেবে পরিচিত ছিল। প্রতিবছর এটার কারণে সৃষ্ট বন্যায় তাদেরকে প্রচুর লোকসান গুনতে হতো। দইমই পলিসি হাতে নেয়ার পর নদীটাকে শাসন করে তার পানিকে তারা একশ’ ভাগ ব্যবহারে নিয়ে এলো। প্রত্যেকটা গ্রামের প্রতিটি বাড়ির সামনে দিয়েই ব্লক করে কৃত্রিম নালার মাধ্যমে নদী থেকে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমি যখন ওখানে গেলাম তখন চলছিল খরা মৌসুম। অথচ আমি একটি নদী অথবা ক্যানেল পেলাম না যেখানে পানি নেই। এই পানি দিয়ে তারা সেচ কাজ করছে। এই পানি তারা মাছ চাষে ব্যবহার করছে। রান্নাবান্না এবং খাওয়ার কাজেও একই পানি ব্যবহৃত হচ্ছে। উৎপাদিত শস্যের ট্রান্সপোর্টেশনের কাজেও ব্যবহার করছে ক্যানেলগুলো। সব ধরনের শস্য নৌকায় করে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় অত্যন্ত কম খরচে আনা নেয়া চলছে। আবার ক্যানেলগুলোর দু’ধারে রাস্তা আছে যার প্রয়োজন রাস্তা ব্যবহার করছে। একসময় যে নদী তাদের জন্য অভিশাপ ছিল, আজকে দৈনন্দিন জীবনযাপন থেকে আরম্ভ করে কৃষিকাজ, শস্য পরিবহন সর্বক্ষেত্রেই তারা মেকং ডেল্টা রিভারের পানির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করেছে।

অথচ নদীমাতৃক দেশ হয়েও শুকনো মৌসুমে আমাদের অনেক নদীই পানি শুন্য হয়ে যায়। ভরাট হয়ে যাওয়ার কারণে বর্ষা মৌসুমে আবার অল্পতেই নদীগুলো উপচে গিয়ে বন্যার সৃষ্টি হয়। গত ৩০ বছর ধরে আমরা সেচ কাজে গভীর নলকূপ ব্যবহার করছি। এর মাধ্যমে আমরা শস্য উৎপাদন বাড়িয়েছি ঠিকই কিন্তু মাটির নিচের পানির স্তরকে আমরা শুষে নিয়েছি। পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করে ফেলেছি। অথচ আমাদের নদীগুলো যদি নিয়মিত খনন করা হতো, নদীগুলো যদি সঠিকভাবে শাসন করা যেতো, তাহলে আজকে আমাদের এই সমস্যাগুলোর মুখে পড়তে হতো না। ভিয়েতনামের আজকের এই সাফল্যের মূলে রয়েছে তাদের পলিসি। একটা দেশের পলিসি যদি ঠিক থাকে দেশটা যে কতো সহজে এগিয়ে যেতে পারে ভিয়েতনাম তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আর পলিসিটাকে অবশ্যই হতে হবে দীর্ঘমেয়াদি। একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকতে হবে যে আগামী ১৫ বছর পর আমরা আমাদের কৃষিখাতটাকে ওই পর্যায়ে নিয়ে যেতে চাই। আমাদের দেশে সবকিছুই হয় পাঁচ বছর মেয়াদি। এটা আমাদের দেশে উন্নয়নের একটি বড় বাধা।

ভিয়েতনামে একজন ক্ষুদ্র কৃষক তার আঙিনায় যে পরিমাণ চাষাবাদের সঙ্গে জড়িত তা অকল্পনীয়। উঠানের ভেতরেই ছোট ছোট ৮-১০টি পুকুর খুঁড়ে পলিথিনের ওপর পানি ঢেলে ওখানেই রেণু ছাড়ছে। রেণু থেকে ওখানেই মাছগুলো বড় হচ্ছে। সেখানে খুব কম বাড়িতেই বিশাল পুকুর রয়েছে। অধিকাংশ বাড়িতেই আঙিনার মাঝে ছোট ছোট পুকুর তৈরি করে নেয়া হয়েছে। আর মাশরুমের ক্ষেত্রেও ভিয়েতনাম অনেক বড় রপ্তানিকারক দেশ। যে জমি থেকে তারা ধান তুলছে সেই জমির নাড়াগুলোকে স্তুপ করে পচিয়ে রেখে সেখানে মাশরুমের বীজ ঢুকিয়ে দিচ্ছে। এভাবে ২০-২৫ দিনের মধ্যে ওখান থেকে সে মাশরুম তুলে আনছে।

তার কোনো জমি কখনো পড়ে থাকছে না। বহুমুখী কাজে তারা জমিগুলো ব্যবহার করছে। আরেকটা বিষয় হচ্ছে, তাদের বাজারটা খুবই নিশ্চিত। কৃষকরা তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করে ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে। কারণ তাদের কৃষক সংগঠন আছে। আমাদের দেশে একজন কৃষক পণ্য নিয়ে বাজারে আসার আগেই জেনে যাচ্ছে আজকে এটা দশ টাকায় বিক্রি হবে। কারণ বাজার নিয়ন্ত্রণ করছে ফরিয়া আর মধ্যসত্ত্বভোগীরা। এরাই দাম বেধে দিচ্ছে। কিন্তু কৃষকের উৎপাদন খরচই হয়তো এগারো বা বারো টাকা। যেহেতু এটা পচনশীল দ্রব্য সুতরাং বিক্রি করতেই হবে। তার ওপর আছে ভ্যান ভাড়া। আরো সময় গেলে খরচ আরো বাড়বে। এসব কারণে সে বাধ্য হয়েই তার উৎপাদিত পণ্য কম দামে বিক্রি করে দেয়। কিন্তু ভিয়েতনামে কৃষক সংগঠন আছে এই সংগঠনগুলো বাজার দর নিয়ন্ত্রণ করে। কোনো একটি নির্দিষ্ট দিনে যদি তাদের উৎপাদন খরচ ১০ টাকা থাকে তবে সেদিন তারা পণ্যের দাম ১১ টাকা নির্ধারণ করে দেয়। আর আমাদের দেশে এই চিত্রটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। ফড়িয়ারা আমাদের দেশে বাজারদর নিয়ন্ত্রণ করে। তারা ঠিক করে যে আজকে আমরা ৮ টাকার বেশি দিয়ে পণ্য ক্রয় করবো না। ওদের কৃষক ক্লাবগুলো সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছে। সকালবেলা কাজে যাওয়ার আগে মিটিং করে সবাইকে কাজ বুঝিয়ে দেয়া হয়। যেখানে মিটিং হয় সেটাকে হ্যামলেট বলে। হ্যামলেটে সকাল বেলা কৃষক প্রতিনিধি, কৃষি কর্মকর্তা, টিএনও সকলেই উপস্থিত থাকেন। মিটিংয়ে সবাই যার যার দায়িত্ব বুঝে নিয়ে কাজে চলে যান। ওখানে জবাবদিহিতা আছে। আমাদের এখানেও কৃষক সংগঠন আছে(কৃষক দল, কৃষক লীগ)। কিন্তু এগুলো রাজনৈতিক সংগঠন। এই সংগঠনগুলো কৃষকের ভাগ্য উন্নয়নে কোনো কাজ করে না। কাজেই সে রকম কৃষি সংগঠন গড়ে তুলতে না পারলে বাংলাদেশের কৃষকদের ভাগ্য পরিবর্তন সম্ভব নয়।

পুরো ভিয়েতনামটাই পাহাড়ি এলাকা। অধিকাংশই গ্রামাঞ্চল। ফলে এখানকার জনগণের একটা বিরাট অংশ উৎপাদক শ্রেণী। ওরা পয়সা পাচ্ছে বলেই কিন্তু ওদের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ক্রয় করার ক্ষমতা বাড়ছে বলেই সেখানে ইন্ডাস্ট্রি গড়ে উঠছে। ভোক্তা থাকলে ইন্ডাস্ট্রি গড়ে উঠবেই। স্বাভাবিকভাবেই তাদের জীবনযাপনের মান দিন দিন উন্নত হচ্ছে।

গত তিন মাস যাবৎ ‘হৃদয়ে মাটি ও মানুষ’ অনুষ্ঠানে আমি ভিয়েতনামের কৃষি নিয়ে একের পর এক প্রতিবেদন প্রচার করে যাচ্ছি। সেটা দেখানোর পর কৃষি বিভাগও ড্রামসিডার, লীফ কালার চার্ট ইত্যাদি নতুন নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের উদ্যোগ নিয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর ভিয়েতনামে সফরের যাওয়ার আগে ওনার সঙ্গে আমার আলাপ করার সুযোগ হয়েছিল। মূলত কৃষিখাতটা নিয়েই আলোচনা করেছি। ভিয়েতনামে যেসব লাগসই প্রযুক্তি আছে এবং যেগুলো আমাদের আবহাওয়ায় কাজে লাগানো যেতে পারে, সেই প্রযুক্তিগুলো এখানে আনার ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আমার অনেক কথা হয়েছে। কথা বলে ওনাকে এ ব্যাপারে বেশ আগ্রহী মনে হয়েছে।

ভিয়েতনামিরা পরিশ্রমী জাতি। পুরুষদের পাশাপাশি নারীরাও ঘরে বাইরে সমান কাজ করে

শাইখ সিরাজ কথা বলছেন এক কৃষিজীবীর সঙ্গে

লিফ কালার চার্ট একটা বিশেষ প্রযুক্তি। ধানের চারার বয়স যখন ৩০-৫৫ দিন হয় তখন একবার ইউরিয়া সার দিতে হয়। নাইট্রোজেনের অভাব পূরণ করার জন্য ইউরিয়া সার প্রয়োগ করা হয়। মাঝেমধ্যে দেখা যায় ধানের চারার রঙ হলদেটে হয়ে গেছে। নাইট্রোজেনের অভাবেই এমনটা হয়ে থাকে। অনেক সময় কৃষক তার চারার রঙ সবুজ করার জন্য প্রয়োজনে হালের বদল বিক্রি করে দিয়েও টাকা যোগাড় করে জমিতে ইউরিয়া সার দেয়। এই যে ইউরিয়া দিয়ে নাইট্রোজেনের অভাব পূরণ করছে, সেখানে কী পরিমাণ ইউরিয়া প্রয়োগ করতে হবে সেটা কৃষকের জানা নেই। এই লিফ চার্টে চারটা রঙ দেয়া আছে। হলদে সবুজ, হালকা সবুজ, একটু গাঢ় সবুজ এবং পুরোপুরি সবুজ। ধান গাছের পাতা চার্টের সঙ্গে ধরলে যদি একেবারে সবুজ রঙের সঙ্গে মিলে যায় তাহলে আর ইউরিয়া দেয়ার প্রয়োজন নেই। পাতার রঙ যদি হলদে সবুজের সঙ্গে মিলে তাহলে তার জমির মোট পরিমাণের সঙ্গে চার গুণ করলে যে সংখ্যাটা দাঁড়ায় তত কেজি সার দিতে হবে। এভাবে হালকা সবুজ ও একটু গাঢ় সবুজ রঙের জন্য জমির মোট পরিমাণের সঙ্গে যথাক্রমে ৩ ও ২ দিয়ে গুণ করলে সারের পরিমাণটা বের হয়ে যায়। অথচ গত ৩০ বছর ধরে অবাধে সার প্রয়োগ করে আমরা পরিবেশ এবং জমির উর্বরতা নষ্ট করে ফেলেছি। আমাদের দেশে ৭টি সার কারখানা আছে। সেখান থেকে বছরে প্রায় ২১ লাখ মেট্রিক টন সার উৎপাদিতহয়। এরপরও প্রতিবছর আমাদের আরো ৪-৫ হাজার মেট্রিক টন সার আমদানি করতে হয়। তারপরেও দেখা যায় বাজারে সারের মূল্য বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু লিফ কালার চার্ট ব্যবহারের মাধ্যমে সারের ব্যবহার অনেক কমিয়ে আনা সম্ভব। তখন তখন হয়তো দেখা যাবে বছরে ১৫ লাখ মেট্রিক টন সার উৎপাদন করলেই নিজেদের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশেও সার রপ্তানি করা সম্ভব হবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে কৃষকের উৎপাদন খরচ অনেক কমে যাচ্ছে। এখন এক বিঘা জমিতে ধান উৎপাদন করতে শ্রম ছাড়া বাকি সব মিলিয়ে মোট খরচ পড়ে চার হাজার টাকা। আর ড্রামসিডার, লিফ কালার চার্ট ইত্যাদি প্রযুক্তি ব্যবহার করে সে উৎপাদন খরচ কমিয়ে আনা সম্ভব ২ হাজার টাকায়।

কৃষিক্ষেত্রে আমাদের পিছিয়ে থাকার আরেকটা প্রধান কারণ হচ্ছে আমাদের দেশের নীতিনির্ধারকরা সকলেই শহরে বসবাসরত সভ্য জনগোষ্ঠী। খুব সহজেই এরা খাদ্যশস্যটা পেয়ে যাচ্ছেন বলে কৃষকরা তাদের কাছে গুরুত্বহীন হয়ে পড়ছে। এখন পর্যন্ত আমাদের দেশে মোটা চাল ১৬-১৮ টাকায় পাওয়া যায়। যদি এটার দাম বেড়ে গিয়ে ২৫-৩০ টাকা হতো তাহলে আমাদের সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বদলে যেতো। গত ৩০ বছরে আমাদের দেশে যতগুলো সরকার এসেছে সবাই ধান-চাল নিয়ে রাজনীতি করেছে। যার কারণে কখনোই তারা চালের দাম খুব বেশি বাড়তে দেয়নি। কারণ চালের দাম বাড়লেই সরকারের অবস্থান নড়বড়ে হয়ে যাবে। এ কারণেই আমাদের কৃষকরা মার খাচ্ছে। কৃষক তার উৎপাদিত পণ্যের যদি নিশ্চিত বাজার পেতো, ন্যায্য মূল্য পেতো তাহলেই তার ভাগ্যের পরিবর্তন হতো। তার জীবনযাপনের মান উন্নত হতো, ক্রয়ক্ষমতা বাড়তো। কৃষকের ক্রয়ক্ষমতা বাড়লে দেশে নতুন নতুন শিল্প কারখানা গড়ে উঠতো।

কৃষক নিজের চেষ্টায় নিজের ভরন পোষণের তাগিদে ধান ছাড়াও আরো অনেক ফসল উৎপাদন করে। কিন্তু সেখানেও সে ন্যায্য দাম পাচ্ছে না। এখানে কৃষকদের ধান উৎপাদনের পেছনে যে কারণটা সবচেয়ে বেশি কাজ করে তা হলো, আমাদের প্রধান খাদ্য হচ্ছে ভাত। জীবিকার অন্য কোনো সংস্থান থাকলে সে কখনো ধান উৎপাদন করতো না। সিলেটে গত তিন বছর ধরে কৃষকরা টমেটো উৎপাদন করে সয়লাব করে ফেলেছে। কিন্তু বাজারে তাদেরকে টমেটো বিক্রি করতে হচ্ছে উৎপাদন খরচের অর্ধেক দামে। ফলে আস্তে আস্তে তারা টমেটো উৎপাদনে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। অথচ প্রতিবছর আমরা বাইরের দেশ থেকে কোটি কোটি টাকার টমেটোর সস আমদানি করছি। এখানে যদি টমেটো প্রসেসিং প্লান্ট স্থাপন করা হতো তাহলে হয়তো আমাদের আর বাইরে থেকে সস আমদানি করতে হতো না। আবার কৃষকরাও তাদের শস্যের সঠিক দাম পেতো।

নরসিংদির একজন কৃষক ফুলকপি উৎপাদনের পর পাইকারের কাছে একেকটা কপি বিক্রি করে দিচ্ছে তিন টাকা করে। এই কপিটা ৫-৬ হাত ঘুরে কাওরান বাজারে যখন আসছে সেখানকার খুচরা বিক্রেতারা এটা কিনছে ১৮-১৯ টাকা দিয়ে। এই কপিই শান্তিনগর বাজার থেকে একজন ক্রেতা কিনছে ৩০ টাকায়। একজন কৃষক কপি প্রতি দাম পাচ্ছে ৩ টাকা। আর একজন ভোক্তা সেই কপি কিনছে ৩০ টাকা দিয়ে। মাঝখানের ২৭ টাকার পুরোটাই কিন্তু চলে যাচ্ছে মধ্যস্বত্বভোগী বা ফড়িয়াদের হাতে। বাংলাদেশের মতো একটা জায়গা থেকে ফড়িয়াদের সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ করা সম্ভব নয়। পৃথিবীর সব দেশেই কম বেশি ফড়িয়া আছে। কিন্তু কৃষিভিত্তিক শিল্প গড়ে তুললে ফড়িয়াদের দৌরাত্ম্য কমিয়ে আনা সম্বভ হবে।

আমাদের দেশে আরেকটা বড় সমস্যা হচ্ছে একটি ফসলের একমুখী ব্যবহার। ফুলকপির কথাই বলা যাক। কৃষক ফুলকপিগুলো বিক্রির আগে তার ডাটা ভেঙে ভেঙে ক্ষেতের মধ্যেই ফেলে দিচ্ছে। কখনো সেই ডাটা গরুতে খাচ্ছে, কখনোবা পচে নষ্ট হচ্ছে। এই ডাটাগুলোকেও কিন্তু প্রসেসিং করে খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এ রকম ভাবে ধানের কুড়া, তুষ চালের গায়ের ওপর যে প্রলেপ অর্থাৎ রাইস ব্রাইন যা থেকে ভোজ্যতেল উৎপাদন সম্ভব। এগুলোকেও খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়। একটা ফসলের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারলে কৃষকদের আয় অনেক বেড়ে যেতো। কিন্তু আমাদের দেশে ফসলের বহুমুখী ব্যবহার করা হয় না বলে কৃষকরা টাকা পাচ্ছে না। আবার দেশে কৃষিভিত্তিক শিল্পও গড়ে উঠছে না। শুরু করেদিলাম ভিয়েতনামের উন্নয়নের গল্প দিয়ে আবার শেষ করি আমাদের উন্নয়রে গল্প বলে- মাঝখানে এই ৩০টি বছর আমরা কোথায়? প্রশ্ন পাঠকের কাছে।